# স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে
পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ


গবেষক
অজয় বর
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার-A00IR1200218



তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. পার্থ প্রতিম বসু
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ


২০২৫

# স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

## সারসংক্ষেপ

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতার পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এশিয়া মহাদেশে নতুন নতুন আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের একটি প্রবণতা সূচিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাষ্ট্র নির্মাণের এই প্রক্রিয়া একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের প্রতিরোধ আন্দোলনের ফল, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বাস্তব পরিণতি। এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-এর ভিত্তিতে ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাজন কেবল একটি ভূখণ্ড ভাগের ঘটনা নয়; এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নির্মাণ, যা উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এক অস্থির, বেদনার্ত ও জটিল বাস্তবতার সূচনা করে। দেশভাগের প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্মীয় পরিচয়—যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য পাকিস্তান এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের জন্য ভারত রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু এই দ্বৈত জাতীয়তাবাদের ধারণা উপমহাদেশের বহুবিধ ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করেছিল। ফলে যে রাষ্ট্রগুলি গঠিত হল, সেগুলিতে বিশেষ একটি ধর্ম 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা' প্রতিষ্ঠা পেলেও অন্যান্য বহু ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠী 'সংখ্যালঘু' হিসেবে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। যেমন- ভারতের মুসলিমরা, যারা দেশভাগের পরেও ভারতে থেকে গিয়েছিল, তারা রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও প্রায়শই তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হতে থাকে। একইভাবে পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দুরাও 'ভারতের প্রতি অনুগত' - এই অভিযোগে প্রান্তিকতা, সহিংসতা ও ভূমি-অধিকার হারানোর মতো নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। বস্তুতপক্ষে, দেশ বিভাজনের একটি অন্যতম ফল ছিল বাংলার দ্বিখণ্ডন, যার ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু স্বাধীনতার পরও সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ হয়নি; বরং নতুন রাষ্ট্রেও তারা 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। সুতরাং দেশভাগ শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, এটি একটি চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া, যা সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে নিরন্তর পুনর্গঠন করে চলেছে, যা বর্তমানে গবেষণার অন্যতম একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

ভারতবর্ষ যদিও স্বাধীনতা লাভের পর একটি 'গণতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সহ নানাবিধ উদ্যোগ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য গৃহীত হলেও বাস্তব চিত্রে

ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নের মুখে পড়ে। ভারতীয় মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের কাঠামোগত বৈষম্য, উন্নয়নের অসম বণ্টন এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে পশ্চাদপদতার শিকার। এই প্রেক্ষাপটে ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত সাচার কমিটি দেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র উন্মোচিত করে। উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, মুসলমানরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের চেয়েও অনগ্রসর অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ কম, কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্ব প্রায় নগণ্য।[1] এইসব বাস্তবতা স্পষ্ট করে তোলে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক আদর্শ আর বাস্তব রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরের মাঝে একটি সুস্পষ্ট ফাঁক রয়েছে। এই বৃহত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠে আসে, যা দেশভাগের পর ভারতে থাকা অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে রয়ে যায়, একদিকে রাজ্যটি দীর্ঘদিন বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ঐতিহ্য বহন করেছে, অন্যদিকে এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান আশানুরূপ নয়। বিশেষ করে রাজ্যের মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দারিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, এবং প্রশাসনিক বঞ্চনার চিত্র প্রকট। যদিও নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলিমদের ভোটব্যাংক হিসেবে দেখা হয়েছে বহুবার, তথাপি তা তাদের ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ স্বাধীনতার পরবর্তী সাত দশকে একাধিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে পরিবর্তন, ভূমি সংস্কার, শিল্পায়ন, গ্রামীণ ও শহুরে বিকাশের প্রক্রিয়া, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপান্তর — সবকিছুই সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একইসঙ্গে, দেশভাগের ফলে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন এবং এখানে আসার পর তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া স্থানীয় সমাজ কাঠামো ও আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যে নতুন মাত্রা যোগ করে।

বস্তুতপক্ষে, সংখ্যালঘু (Minority) শব্দটি বর্তমানকালে বহু ব্যবহৃত ও চর্চিত শব্দ। এখন প্রশ্ন হল সংখ্যালঘু কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ অর্থে বলা যেতে পারে, সংখ্যাগত বিচারে যারা সংখ্যায় বেশি তারা সংখ্যাগুরু, এবং যারা সংখ্যায় কম তারা সংখ্যালঘু। এক্ষেত্রে সংখ্যায় কম-বেশি নির্ধারণ করার জন্য জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ডকে ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ, যেখানে বহু জাতি, ভাষা ও ধর্মাবলম্বীর মানুষের বসবাস রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সকল উপাদানগুলিকে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টির নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই

[1] Sachar Committee Report (November, 2006), 'Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India', Govt. Of India

ধর্মীয় বিবেচনায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর (যেমন- মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন) মানুষজনকে সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে, 'সংখ্যালঘু' শব্দটি শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর পরিমাণ নির্দেশ করে না, বরং এর মধ্যে নিহিত থাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনে অসমতা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাইরন ওয়েনার এর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েনার (Myron Weiner) তাঁর 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?" প্রবন্ধে বলেছেন যে, "A People who do not share what they regard as the central symbols of the society invariably view themselves as a minority"[2] অর্থাৎ যে সকল মানুষ নিজেদেরকে সমাজের মূলস্তরের প্রতীক বা অংশ হিসেবে মনে করে না তারা সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুত্ব এক বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা, যা প্রায়শই সংখ্যার তুলনায় রাষ্ট্র–সমাজ কাঠামোর সঙ্গে জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান গবেষণায় সংখ্যালঘুত্বকে একটি প্রক্রিয়াগত ও সামাজিক নির্মাণ হিসেবে দেখা হয়েছে—যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দু সম্প্রদায় উভয়েই প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে।

উইল কিমলিকার (Will Kymlicka) তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী, সংখ্যালঘুদের মূলত দুই ধরণের শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—"ন্যাশনাল মাইনরিটি" এবং "এথনিক/ইমিগ্রান্ট মাইনরিটি"। ন্যাশনাল মাইনরিটি সাধারণত একটি স্বতন্ত্র জাতি বা ঐতিহাসিক অঞ্চলভিত্তিক গোষ্ঠী, যাদের রয়েছে আলাদা সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিচয় (যেমন ভারতের কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী)। অপরদিকে ইমিগ্রান্ট মাইনরিটিগণ অন্য দেশ থেকে অভিবাসনপ্রাপ্ত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে বসবাস করেও সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা থাকে[3]। এই ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু উদ্বাস্তুরা ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও রাষ্ট্রীয় নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তারা "ইমিগ্রান্ট মাইনরিটি" হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং একদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা ভারতের বৃহত্তর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে সামাজিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং রাজনৈতিক প্রতীকীকরণের শিকার। অপরদিকে, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুরা সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ, কিন্তু অভিবাসী অভিজ্ঞতা, এবং একটি নতুন রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে অভিযোজন ও অন্তর্ভুক্তিকরণের সংগ্রাম তাদের আবার এক ভিন্ন ধরণের 'সংখ্যালঘুতা'তে আবদ্ধ করেছে। এই দুই ধরণের সংখ্যালঘুত্বের মধ্যে একটি মৌলিক সাযুজ্য হল- উভয় সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রিক নাগরিকত্বের কাঠামোর মধ্যে নিজেদের স্থান নিয়ে এক অনিশ্চয়তা বোধ করেন। তাই এই গবেষণায় সংখ্যালঘুত্বকে কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, বরং অভিজ্ঞতার, বঞ্চনার ও নাগরিকতার

[2] Weiner, Myron, (1998) 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?' In P. Chatterjee (ed). State and Politics in India, Calcutta, Oxford University Press, p. 462.

[3] Kymlicka, Will (1995), 'Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights', New York, Oxford University Press, P.P. 11-25.

রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে  পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাকে  আরও বিস্তৃত এবং প্রাসঙ্গিক করতে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাস্তবতাকেও পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং কেন তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে চলে আসছে (বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে)-সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, দুটি আলাদা রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে থাকা এই দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাব তুলে ধরে, অন্যদিকে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাঠামোতে সংখ্যালঘুদের অবস্থান কীভাবে নির্ধারিত হয়, সে সম্পর্কেও একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কারণ তুলনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, একই সাংস্কৃতিক-ভাষাগত ঐতিহ্যের দুই অংশ কীভাবে ভিন্ন রাষ্ট্রিক কাঠামো ও সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে পৌঁছেছে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বাস্তবতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কেবলমাত্র তথ্যগত নয়, বরং এটি উপমহাদেশীয় ধর্ম-রাষ্ট্র-পরিচয়ের আন্তঃসম্পর্কিত সংকট ও সম্ভাবনার একটি মূল্যবান অনুসন্ধান। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার একটি মৌলিক যুক্তি নিহিত রয়েছে তাদের ইতিহাস, ভৌগোলিক সংলগ্নতা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীর কাঠামোর ভিন্নতর বাস্তবতায়। উভয় অঞ্চলই একসময় অবিভক্ত বঙ্গের অংশ ছিল, ফলে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশে অভিন্ন।

**সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review):**

সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণামূলক সমস্যা ও ধারণা লাভের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যার দ্বারা গবেষণামূলক বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই গবেষণার ক্ষেত্রে Literature Review দ্বারা সংখ্যালঘুর ধারণা, সামগ্রিকভাবে ভারতের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থান, এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুরা আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে কতখানি উন্নত হয়েছে, কোথায় এখনও বঞ্চনা বিরাজমান, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তব অবস্থান কী? - তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশবিভাজন ও তার পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

লুইস ওয়ার্থ (Louis Wirth) 'Morale and Minority Groups' (1941)[4] তাঁর এই প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির সামাজিক অবস্থা ও জাতীয় ঐক্যের উপর তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। তিনি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সংজ্ঞায়িত করেন এমন জনগোষ্ঠী হিসেবে, যারা শারীরিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে বৈষম্যের শিকার হয় এবং নিজেদের 'ভিন্ন' হিসেবে চিহ্নিত করে। ওয়ার্থ দেখান, সংখ্যালঘুদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অভাবনীয় বৈষম্য এবং ইতিহাসগত নিপীড়ন তাদের জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশেষ করে জাতিগত বিভাজন, ভাষাগত বাধা, এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা সংখ্যালঘুদের জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তিনি যুক্তি দেন, যদি সংখ্যালঘুদের আশা দেওয়া হয় যে তারা সাম্যের মাধ্যমে মূলধারার অংশ হতে পারবে, তবে তারা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ওয়ার্থ মনে করেন যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বঞ্চনা শুধু সামাজিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে না; বরং বহিরাগত প্রচারণার জন্য সমাজকে বিভক্ত করে দুর্বল করে তুলতে পারে, যেমন নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট প্রচারণার ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তিনি জোর দেন, জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হলে সংখ্যালঘুদের প্রতি সমতা ও মর্যাদার নীতিতে মনোযোগী হতে হবে।

Ted Robert Gurr এবং James R. Scarritt এর 'Minorities Rights at Risk: A Global Survey' (1989)[5] এই প্রবন্ধটি পৃথিবীর ২৬১টি অ-সার্বভৌম, সংখ্যাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং পৃথক ও অসম আচরণের শিকার গোষ্ঠীর ওপর আলোকপাত করে, যাদের লেখকদ্বয় "minorities" বা সংখ্যালঘু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এখানে সংখ্যালঘু বলতে শুধু সংখ্যা নয়, বরং এমন সম্প্রদায় বোঝানো হয়েছে যাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে পৃথক সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় পরিচয় রয়েছে এবং যাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। প্রবন্ধের প্রথম অংশে 'Rights at Risk' ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার – বিশেষত নিরাপত্তা ও জীবিকা – হুমকির মুখে রয়েছে। তাঁরা বলেন, এই ঝুঁকি রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মাধ্যমে, অথবা সামাজিক প্রথার মাধ্যমে তৈরি হতে পারে। প্রবন্ধটি সংখ্যালঘুদের চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করে: (ক) রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার গোষ্ঠী, যারা সমান রাজনৈতিক অধিকার পায় না বা দমনমূলক রাষ্ট্রীয় নীতির শিকার হয়; (খ) অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার গোষ্ঠী, যাদের জীবিকার সুযোগ সীমিত বা বঞ্চিত; (গ) স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার গোষ্ঠী, যারা অঞ্চলভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার দাবি করে; (ঘ) ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু, যারা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর আধিপত্য করে। এখানে "rights at risk" বোঝাতে এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যা আসল অধিকারের লঙ্ঘনের বদলে সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে। এটি ছিল একটি নতুন পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ বৈশ্বিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিমাপ

---

[4] Wirth, Louis (1941), 'Morale and Minority Groups', American Journal of Sociology, Vol. 47, No. 3, The University of Chicago Press, p.p. 415-433.

[5] Gurr, Ted Robert, and James R. Scarritt (1989), 'Minorities Rights at Risk: A Global Survey', Human Rights Quarterly, Vol. 11, No. 3, The Johns Hopkins University Press, p.p. 375-405.

করতে পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য উপাত্ত পাওয়া কঠিন। তাঁরা এটাও ব্যাখ্যা করেন যে, সমাজে অনেক গোষ্ঠী হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু তারা ক্ষমতার বাইরে থাকায় "restricted majorities" হিসেবে বিবেচিত হয়, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী বা ইরাকে শিয়া মুসলমানরা।

উইল কিমলিকা 'Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights' (1995)[6] বইটিতে মূলত উদারনৈতিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকারের স্থান ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, উদারনৈতিক ন্যায্যতার ধারণাকে পুনরায় চিন্তা করা জরুরি, কারণ উদারনীতি কেবল ব্যক্তিগত অধিকারের সুরক্ষাকেই নয়, সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কিমলিকা এখানে 'জাতিগত সংখ্যালঘু' (ethnic minorities) এবং 'জনগোষ্ঠী' (national minorities)-এর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য তৈরি করেন এবং দেখান যে, এই দুই ধরনের গোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত দাবি ভিন্ন ধরণের সমাধান দাবি করে। কিমলিকা দেখান যে, সমতা (equality) নিশ্চিত করতে হলে অনেক সময় সংস্কৃতি-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বিশেষ অধিকার (group-differentiated rights) দিতে হবে। তবে এই বিশেষ অধিকারের ধারণা তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা উদারনৈতিক মূলনীতির পরিপন্থী নয় বরং তারই সম্প্রসারণ। তিনি "কান্ট্রোল ওভার কালচার" (control over culture) ধারণার মাধ্যমে দেখান যে ব্যক্তির মুক্তি ও আত্মনির্ধারণ (self-determination) যথার্থভাবে অর্জিত হয় তখনই, যখন সে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে। সাংস্কৃতিক অধিকার তাই শুধুমাত্র গোষ্ঠীভিত্তিক দাবি নয়, বরং ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার পূর্বশর্ত। বইটিতে কিমলিকা পশ্চিমা উদারনৈতিক দর্শনের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে দেখান যে, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা দাবি করা হলেও বাস্তবে রাষ্ট্র সবসময় নির্দিষ্ট সংস্কৃতির পক্ষে অবস্থান নেয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং ভারতসহ একাধিক বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, উদারনৈতিক মৌলনীতি মেনে চলেও রাষ্ট্রগুলি সংখ্যালঘু জাতিসমূহের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি বিধান করতে পারে এবং উচিতও। তবে কিমলিকা সতর্ক করেন যে, সবধরনের গোষ্ঠীগত দাবি সমানভাবে বৈধ নয়। বিশেষ করে, যদি কোনো গোষ্ঠী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী দাবি করে, তবে সে দাবি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এভাবে তিনি "অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা" (internal restrictions) এবং "বাহ্যিক সুরক্ষা" (external protections)-র মধ্যে পার্থক্য করে দেখান। অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা মানে গোষ্ঠী নিজেদের সদস্যদের স্বাধীনতা খর্ব করে; যা কিমলিকা প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে বাহ্যিক সুরক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির বাইরের চাপ থেকে আত্মরক্ষার বৈধ ব্যবস্থা।

---

[6] Kymlicka, Will (1995), 'Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights', New York, Oxford University Press.

চার্লস টেলর এর 'The Politics of Recognition' (1992)[7] প্রবন্ধটি আধুনিক পরিচয় ও মর্যাদার রাজনীতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ। টেলর যুক্তি দেন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির আত্মপরিচয় গঠনে সামাজিক স্বীকৃতি অপরিহার্য। তিনি বলেন, আধুনিক সমাজে কেবল সাম্যের দাবি নয়, বরং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের স্বীকৃতিও ন্যায্যতার একটি মৌলিক শর্ত। টেলর দেখান যে, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার দাবির আড়ালে অনেক সময় প্রভাবশালী সংস্কৃতির আধিপত্য বজায় থাকে, ফলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি তাদের আত্মপরিচয়ে আঘাত অনুভব করে। তাঁর মতে, সংস্কৃতি ও ভাষার স্বীকৃতি কেবল সৌজন্য নয়, ন্যায়ের অপরিহার্য দাবি। তবে স্বীকৃতির দাবি মূল্যায়নের জন্য তিনি মানবাধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সার্বজনীন নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বহুসাংস্কৃতিক সমাজে ন্যায়বিচার ও মর্যাদা সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নে টেলরের চিন্তাভাবনা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভিখু পারেখ (Bhikhu Parekh), 'Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory' (2000)[8] এই বইয়ে দেখিয়েছেন যে আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি অধিকাংশ সময় একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি—বিশেষত পশ্চিমা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি—ধরে নিয়ে নীতি তৈরি করে, ফলে সংখ্যালঘু সংস্কৃতিগুলি প্রান্তিক থেকে যায়। তিনি যুক্তি দেন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজে ন্যায় নিশ্চিত করতে হলে কেবল সহনশীলতা নয়, বরং পারস্পরিক সম্মান ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি জরুরি। সংখ্যালঘুদের ধর্ম, ভাষা ও জীবনাচারকে যদি রাষ্ট্র ও সমাজ মর্যাদা না দেয়, তাহলে তা কেবল সাংস্কৃতিক বৈষম্যই নয়, রাজনৈতিক অপ্রতিনিধিত্ব ও ন্যায়ের অভাব সৃষ্টি করে। পারেখ বলেন, সংস্কৃতি আপেক্ষিক ও বহুমাত্রিক, তাই রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণেও বহুস্বর, আন্তঃসংলাপ ও সাংস্কৃতিক নমনীয়তা প্রয়োজন। এই বইটি দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সংখ্যালঘু অধিকারের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

দিলিপ কুমার মহারানা (Dilip Kumar Maharana) 'In Defence of Indian Perspective of Multiculturalism' (2010)[9] প্রবন্ধে ভারতীয় বহুসাংস্কৃতিকতাবাদের একটি গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী রূপায়ণ উপস্থাপন করে, যেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সংবিধানিক বাস্তবতা—পশ্চিমী দেশগুলোর মতো সরকারিভাবে ঘোষিত বহুসাংস্কৃতিক নীতির অনুপস্থিতিতেও—প্রকৃত অর্থে বহুসাংস্কৃতিকতা ধারণ করে আছে। প্রবন্ধটি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির একমুখী ব্যাখ্যার বিপরীতে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে তুলে ধরেছে। মহারানা দেখিয়েছেন যে ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য—ধর্ম,

---

[7] Taylor, Charles (1992), 'The Politics of Recognition' In A. Gutmann, (ed). 'Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition', New Jersey, Princeton University Press, p.p. 25-74.

[8] Parekh, Bhikhu (2000), 'Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory', Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

[9] Maharana, Dilip Kumar, (2010), 'In Defence of Indian Perspective of Multiculturalism', The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 1, Indian Political Science Association, p.p. 69-83.

ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির দিক থেকে—একটি বাস্তবতা, যা কেবল রাজনৈতিক শ্লোগানে সীমাবদ্ধ নয় বরং জনজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়। তিনি বলেন, ভারতের বহুসাংস্কৃতিকতা সংবিধানের মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু অধিকার ও ভাষাগত নীতিমালার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও তা কোনো ঘোষিত "মাল্টিকালচারাল পলিসি" নয়। তিনি আরও তুলে ধরেছেন যে ভারতের সামাজিক বাস্তবতায় 'কম্পোজিট কালচার', 'সার্ব ধর্ম সমভাব', 'বাসুদৈব কুটুম্বকম'-এর মতো ধারণাগুলো কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং এগুলো ভারতীয় নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনচর্চার অংশ। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়, ধর্মীয় স্থানে সকলের অংশগ্রহণ, খাবার, পোশাক, সংগীত ও ভাষার মিশ্রতার মাধ্যমে যে সহাবস্থান তৈরি হয়েছে, তা ভারতের নিজস্ব এক বহুমাত্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

মাইরন ওয়েনার তাঁর "India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?"[10] প্রবন্ধে ভারতের ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত ও সামাজিক সংখ্যালঘুদের অবস্থান, চাহিদা এবং আত্মবোধের জটিল বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে। তিনি সংখ্যালঘু ধারণাটিকে শুধুমাত্র সংখ্যার নিরিখে না দেখে, সমাজবদ্ধ আত্মপরিচয়, ক্ষমতার কাঠামো এবং প্রতীকী স্বীকৃতির আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, ভারতে সংখ্যালঘুত্ব একটি আপেক্ষিক ধারণা যা ব্যক্তির অবস্থান, সামাজিক শ্রেণি ও আত্মচেতনার উপর নির্ভর করে। যেমন, মুসলিমরা ভারতে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হলেও জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দুরাই নিজেদের সংখ্যালঘু বলে গণ্য করেন। এখানে তিনি সংখ্যালঘুদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন: ধর্মীয়, ভাষাগত, আদিবাসী এবং জাতিগত/বর্ণগত সংখ্যালঘু। প্রতিটি শ্রেণির ভেতরেও বিভক্তি রয়েছে, যেমন মুসলিমদের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক পার্থক্য, কিংবা শিখদের মধ্যে জাত-শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দাবি ছিল নিজস্ব ভাষাভিত্তিক স্বরাজ্য, যার ফলে ভারতের রাজ্য পুনর্গঠন হয় ১৯৫০-৬০ এর দশকে।

ওয়েনার দেখিয়েছেন, সংখ্যালঘুদের আকাঙ্ক্ষা মূলত "হোমল্যান্ড" (Homeland), "স্বীকৃতি" (Recognition), "সংরক্ষণ" (Reservations), ও "নিরাপত্তা" (security) এর দাবি ঘিরে আবর্তিত হয়। মুসলিমদের জন্য ১৯৪৭ পূর্ববর্তী পাকিস্তান দাবি, শিখদের জন্য পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলন, কিংবা গোর্খাল্যান্ড ও আসাম আন্দোলন—সবই ভূখণ্ডভিত্তিক জাতিগত দাবির বহিঃপ্রকাশ। এর পেছনে রয়েছে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক টিকে থাকার গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ। প্রবন্ধটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ওয়েনার ক্ষমতা ও প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের মধ্যকার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সংখ্যালঘুরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবি করেন না, বরং সামাজিক প্রতীকে নিজস্বতার স্বীকৃতি চান। অনেক সংখ্যালঘু মনে করেন, যারা রাষ্ট্রীয় প্রতীকের সাথে একাত্ম হতে পারেন না, তারা প্রকৃত অর্থে 'co-opted' হয়েছেন। এই প্রবন্ধটি শুধুমাত্র

[10] Weiner, Myron, (1998) 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?' In P. Chatterjee (ed). State and Politics in India, Calcutta, Oxford University Press, p.p. 459-495.

ভারতের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি বোঝার জন্য নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থান বিশ্লেষণে এক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে, যা এই গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

Rowena, Robinson (ed). Minority Studies, (2012)[11] গ্রন্থটি ভারতীয় সমাজে সংখ্যালঘু পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সমাজতাত্ত্বিক রোওয়েনা রবিনসনের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও নৃবৈজ্ঞানিক উদাহরণের সংমিশ্রণে গঠিত, যেখানে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিথস্ক্রিয়ার জটিল বাস্তবতা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকা পর্বে রবিনসন বহুসংস্কৃতিবাদী কাঠামোর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের অবস্থান বিশ্লেষণ করেন এবং সংবিধান, সংরক্ষণ ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গও আলোচনা করেন। প্রথম অধ্যায়টি একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন তোলে—কীভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রভাবনা এবং সামষ্টিক জীবনধারার ভিত্তিতে ভারতীয় গণতন্ত্র টিকে আছে। রবিনসন এর মতে, এর উত্তর নিহিত ভারতের একটি বহুজাতিক ফেডারেশন হিসেবে ধারণায়, যা নৈতিক বহুত্ববাদ অনুসরণ করে এবং ব্যক্তি অধিকার ও সামষ্টিক অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। বস্তুতপক্ষে, প্রথম তিনটি অধ্যায় সংখ্যালঘু ধারণার তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে, যেখানে ভারতকে এক বহুজাতিক ফেডারেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা নৈতিক বহুত্ববাদ অনুসরণ করে। শাহ বানো মামলার আলোকে মুসলিম সংখ্যালঘু পরিচয়ের রাষ্ট্রীয় পুনর্নির্মাণ ও তফসিলভুক্ত জাতির ধর্মীয় মাত্রা সম্পর্কেও বিশ্লেষণ রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কচ্ছের মুসলিম, ঔরঙ্গাবাদের বৌদ্ধ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার খ্রিস্টানদের সংখ্যালঘু বাস্তবতা উন্মোচিত হয়, যেখানে দেখা যায় কিভাবে তারা ধর্ম, জাত ও গোত্র ভিত্তিক পরিচয়ের সংযোগস্থলে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাঠামোর সঙ্গে সমঝোতা করে চলে। পারসিদের আধুনিকতাবাদী অন্বেষণ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সংখ্যালঘু মর্যাদা দাবি – উভয় উদাহরণ হিন্দুধর্ম ও সংখ্যালঘুত্বের আইনগত অস্পষ্টতাকে তুলে ধরে। শিখ পরিচয়ের নির্মাণ ও মুসলিম পরিচয়ের প্রতি বলিউড ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সাংস্কৃতিক রাজনীতি সম্পর্কেও গভীর বিশ্লেষণ রয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রচলিত সংখ্যালঘু সংজ্ঞার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে নানা সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে সংখ্যালঘুত্বের তাৎপর্য খোঁজে। সংখ্যালঘু পরিচয় যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে গঠিত হয় এবং তার রাজনৈতিক তাৎপর্য সমাজ-রাষ্ট্র ও আইনি প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয় – এ সত্যটিকে গ্রন্থটি সফলভাবে তুলে ধরে।

Rowena Robinson-এর প্রবন্ধ 'Religion, 'Socio-economic Backwardness & Discrimination: The Case of Indian Muslims' (2008)[12] একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ যেখানে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে বৈষম্যের জটিল

[11] Robinson, Rowena, (ed). (2012), 'Minority Studies', New Delhi, Oxford University Press.

[12] Robinson, Rowena, (2008), 'Socio-economic Backwardness & Discrimination: The Case of Indian Muslims', Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 44, No. 2. Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources, p.p. 194-200.

সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধে রোবেনা রোবিনসন মূলত তিনটি বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করেছেন: পশ্চাদপদতা, প্রান্তিকতা এবং বৈষম্য। তিনি 'Sachar Committee Report', ২০০১ সালের জনগণনা এবং অন্যান্য সাম্প্রতিক তথ্যসূত্র ব্যবহার করে মুসলিমদের সামাজিক বঞ্চনার বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, শিক্ষাগত পশ্চাদপদতা নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে মুসলিমদের সাক্ষরতা হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এবং শহরাঞ্চলে। কিছু রাজ্যে (যেমন কেরালা) এই পার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম হলেও পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও আসাম রাজ্যে মুসলিমদের শিক্ষাগত অবস্থা খুবই খারাপ। উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ ও স্নাতক সম্পন্ন করার হারে মুসলিমরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক পিছিয়ে, এমনকি তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের থেকেও। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিমরা প্রধানত শহরাঞ্চলে স্বনিয়োজিত পেশায় জড়িত—যেমন রাস্তার হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এই ধরনের কর্মসংস্থানের ফলে তারা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসার ঝুঁকিতে থাকে। ব্যাংক ঋণে প্রবেশাধিকারে মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কম সক্রিয়। কর্মসংস্থানের দিক থেকেও তারা প্রধানত অনিয়মিত শ্রমিক এবং সরকারি ও বড় বেসরকারি খাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম।

তৃতীয়ত, বৈষম্যের প্রসঙ্গে রোবিনসন তুলে ধরেছেন যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম বা অঞ্চলগুলিতে সামাজিক ও পরিকাঠামোগত সুবিধা অত্যন্ত সীমিত—যেমন পাকা রাস্তা, ডাকঘর, হাসপাতাল ইত্যাদির অভাব স্পষ্ট। এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষণীয়। তিনি বলেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের বঞ্চনার পেছনে ধর্মীয় পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা প্রান্তিকতা ও পশ্চাদপদতাকে আরও গভীর করে তোলে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতা মুসলিম পরিবারের শিক্ষা ও জীবিকা পরিকল্পনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জোয়া হাসান (Zoya Hasan) 'Politics of Inclusion: Caste, Minorities and Affirmative Action' (2009)[13] এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির (inclusion) রাজনীতি, বিশেষত ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধি হওয়ার প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংখ্যালঘুদের অধিকার, সংরক্ষণ নীতিমালা এবং সমানাধিকারের ধারণা নিয়ে দীর্ঘকালীন বিতর্ক ও বিভ্রান্তির বিশ্লেষণ করে। হাসান দাবি করেন যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ইতিবাচক বৈষম্যের নীতিমালা প্রণয়নে রাষ্ট্রের দ্বিধান্বিত মনোভাব এবং এর পেছনে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে গঠিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অপব্যাখ্যা একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত মুসলিমদের ক্ষেত্রে, যাদের সরকারী চাকরি, শিক্ষাক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে চরম রকমের অনুপস্থিতি রয়েছে, তা 'সাচার কমিটি'র তথ্য দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে। হাসান অমর্ত্য সেনের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় বর্জনের

[13] Hasan, Zoya, (2009), 'Politics of Inclusion: Caste, Minorities and Affirmative Action', New Delhi, Oxford University Press.

তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, বর্জন কেবল রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে হয় না, বরং সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও ঘটে। তিনি মুসলিম ও খ্রিষ্টান দলিতদের সংরক্ষণ দাবি এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জাতপাত নির্ধারনের সাংবিধানিক দ্ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে জোয়া হাসান শুধুমাত্র অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেননি; বরং তিনি একটি বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অন্তর্ভুক্তির প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো সীমিত সম্পদ ও সুযোগ নিয়ে নানা বঞ্চিত গোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

রাজীব সিংহ, ‘Citizenship, Exclusion & Indian Muslims’ (2010)[14] এই প্রবন্ধে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব-সংকট, সামাজিক বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণহীনতার বহুমাত্রিক চিত্র উপস্থাপন করে। তিনি  টি. এইচ. মার্শালের নাগরিকত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে নাগরিকত্ব শুধুমাত্র আইনি অধিকার নয়, বরং সেটি সক্রিয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে। কিন্তু মুসলমানদের একটি বড় অংশ নানা ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত কারণে এই অধিকারগুলি কার্যত প্রয়োগ করতে পারছে না। প্রবন্ধটি দেখায় যে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সংবিধান, যেখানে সমতা, ন্যায় ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য। ঐতিহাসিকভাবে দেশভাগ, ধর্মীয় বিভাজন, এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ‘divide and rule’ নীতির ফলে মুসলমানরা সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পরেও মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব কমে গেছে এবং নির্বাচন ব্যবস্থায় তারা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। এই প্রবন্ধে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ বলে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা, সরকারি চাকরি, ব্যাংক ঋণ এবং ব্যবসায়িক সুযোগ থেকে তারা প্রায় বঞ্চিত। সচার কমিটির রিপোর্টের তথ্য ব্যবহার করে লেখক দেখিয়েছেন যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অসুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এই অবস্থার পেছনে সরকারের উদাসীনতা, সামাজিক কুসংস্কার এবং বৈষম্যমূলক নীতিগুলোকেই দায়ী করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তা ও ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নাগরিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে আরও বিপন্ন করেছে। প্রবন্ধটি উল্লেখ করে যে মুসলিমরা আজ ভারতের মধ্যে এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে যেখানে তাদের একদিকে দেশদ্রোহীতার সন্দেহ, অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হওয়া ‘তোষণের’ অভিযোগ—দুইয়ের মাঝে ভারসাম্যহীন এক বাস্তবতায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

জয়া চ্যাটার্জি তাঁর ‘The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-1967’ (2007)[15] বইটি বাংলার ইতিহাস ও ভারতের বিভাজন নিয়ে প্রচলিত ধারণাগুলোর বিপরীতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। সাধারণত,

---

[14] Singh, Rajeev, (April-June, 2010), ‘Citizenship, Exclusion & Indian Muslims’, The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 2. Indian Political Science Association, p.p. 497-510

[15] Chatterji, Joya, (2007) ‘Bengal Hindu Communalism and Partition: 1932-1947’, Cambridge, Cambridge University Press,

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির পরিণতি হিসেবে দেখা হয়। বইটি দেশভাগের বিশাল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিণতি মূল্যায়ন করে। বইটি দেখায় যে কীভাবে এবং কেন সীমানা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, সেইসাথে কীভাবে নতুন জাতিরাষ্ট্র তৈরির ফাইল বাংলা এবং ভারত উভয় ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব উত্থান, জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক দৃশ্যপটে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটেছিল।

সুনীত চোপড়া, তাঁর 'Problems of the Muslim Minority in India' (1976)[16] এই প্রবন্ধে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং চ্যালেঞ্জ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। লেখক শ্রেণীগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং একটি সমাধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। লেখক মূলত বামপন্থী ও শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যান্য কারণগুলোর বিশ্লেষণ কিছুটা সীমিত। মুসলমানদের শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) সংক্রান্ত আলোচনা অনুপস্থিত।

Manoj Kumar Singha তাঁর 'Minority Rights: A Case Study of India' (2005)[17] প্রবন্ধে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার, সাংবিধানিক সুরক্ষা, আইনগত কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি বিশদভাবে আলোচনা করে। লেখক মানবাধিকার, সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজের টেকসই উন্নয়নে সংখ্যালঘু নীতি কীভাবে গঠিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বইটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছে।

আবদুল শবান, সম্পাদিত, 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence' (2018)[18] বইটির মূল প্রতিপাদ্য ও কাঠামো হল ভারতের মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে। এছাড়া ভারতের মুসলিমরা জাতীয় রাজনীতিতে একটি "ভোট ব্যাংক" হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে অবহেলিত তা ফুটে উঠেছে। ২০০৬ সালের সাচার কমিটির রিপোর্টের প্রভাব এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বইটি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত, যেখানে বিভিন্ন গবেষক, সাংবাদিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। এই বইটিতে M.J. Akbar, তাঁর 'Minority and

---

[16] Chopra, Suneet, (1976), 'Problems of the Muslim Minority in India', Social Scientist, Vol.5, No.2, p.p. 67-77.

[17] Singha, Manoj Kumar, (2005) 'Minority Rights: A Case Study of India', International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 12, No. 4, p.p. 355-374.

[18] Shaban Abdul, (2018), 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge.

Minorityism: The Challenge before Indian Muslims' (2018)[19] প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুরা রাজনীতির শিকার হয়েছে এবং কীভাবে তাদের প্রান্তিকীকরণ করা হচ্ছে তা তুলে ধরেছেন। সেইসাথে 'সংখ্যালঘুত্ব' (Minorityism) ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বৈত আচারণ মুসলিমদের রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা ব্যবহারের প্রবনতা রাষ্ট্রীয় নীতি ও প্রশাসনের মধ্যে বদ্যমান পক্ষপাতদুষ্টতার দিক তুলে ধরেছেন।

রাম পুনিয়ানি (Ram Puniyani) তাঁর 'Muslims and Politics of Exclusion' (2018)[20] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক মূলধারার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দেশভাগ-পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে সমসাময়িক হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক উত্তরণ পর্যন্ত, মুসলমানদের 'অন্য' রূপে নির্মাণ করে একপ্রকার 'রাষ্ট্রীয় অপর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বর্জন শুধু ভোটব্যাংকের রাজনীতি নয়, বরং উন্নয়ন, শিক্ষা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গণমাধ্যমের মধ্যে প্রোথিত একটি কাঠামোগত বৈষম্য। পুনিয়ানি যুক্তি দেন যে, একদিকে মুসলমানদের তোষণের অভিযোগ উঠলেও বাস্তবে তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক হিংসা ও নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি তাদের আরও 'ঘেটোয়াইজেশন' বা পৃথকীকরণের দিকে ঠেলে দেয়। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি পরিচালিত 'বর্জনের রাজনীতি' কে একবিংশ শতকের বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। এই লেখাটি গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মুসলিম সংখ্যালঘুদের কাঠামোগত বঞ্চনা, রাজনৈতিক উপস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সংকটকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করে। তবে এখানে সমস্যার বিশ্লেষণ বিশদ হলেও নীতিগত সমাধানগুলো তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত।

নূরজাহান সাফিয়া নিয়াজ ও জে. এস. আপ্তে তাঁর 'Muslim Women and Law Reforms: Concerns and Initiatives of the Excluded within the Excluded' (2018)[21] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ভারতের মুসলিম নারীরা দ্বৈতভাবে প্রান্তিক- একদিকে তারা নারী হিসেবে বঞ্চিত, অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে বৈষম্যের শিকার। বইটি ভারতের মুসলিমদের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ।

---

[19] Akbar, M.J. (2018) 'Minority and Minorityism: The Challenge before Indian Muslims' In A. Shaban (Ed). 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge. p.p. 25-36.

[20] Puniyani, Ram, (2018), 'Muslims and Politics of Exclusion' In A. Shaban (Ed). 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge, p.p. 88-106.

[21] Niaz, Noorjehan Safia and Apte, J. S., (2018) 'Muslim Women and Law Reforms: Concerns and Initiatives of the Excluded within the Excluded'. In A. Shaban (Ed.) 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge.

Muin-Ud-Din Ahmad Khan-এর প্রবন্ধ ‘Economic Conditions of the Muslims of Bengal under the East India Company (1737–1860)’ (1967)[22] একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বাংলার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরে।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটলে বাংলার মুসলমানরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হারায় এবং হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়িক শ্রেণির উত্থান ঘটে। কোম্পানি আমলে তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক চাপ (গোমস্তারা, নতুন জমিদার এবং নীলকর) মুসলিম কৃষক ও প্রাক্তন জমিদার শ্রেণিকে নিঃস্ব করে ফেলে। গোমস্তারা জোরপূর্বক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করত, নতুন জমিদার শ্রেণি জমির উপর নিষ্ঠুর খাজনা আরোপ করত, আর নীলকররা কৃষকদেরকে কম পারিশ্রমিকে নীল চাষে বাধ্য করত। এছাড়াও লাখিরাজ (করমুক্ত) ভূমি পুনরুদ্ধার নীতির ফলে হাজার হাজার মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেণি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও সাংস্কৃতিকভাবে পেছনে পড়ে যায়, কারণ তারা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফারসি ভাষাভিত্তিক শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমান সমাজ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।

Bonita Aleaz, ‘Madrasa Education, State and Community Consciousness: Muslims in West Bengal’ (2005)[23] এর প্রবন্ধটি একটি গভীরতর ও তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ গবেষণা, যা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নীতিগত প্রভাব বিশ্লেষণ করে। এই প্রবন্ধে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার তিনটি মাত্রিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন: রাষ্ট্র, মুসলিম সম্প্রদায় এবং শিক্ষার মাধ্যমে পরিচিতি ও চেতনার গঠনের প্রক্রিয়া। Aleaz দেখিয়েছেন যে, যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি প্রাথমিকভাবে সহানুভূতিশীল, তবুও কাঠামোগত সংস্কার, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কিংবা অবকাঠামোগত সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রায় গৌণ। এই শিক্ষাব্যবস্থার কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ মূলধারার অর্থনীতি বা শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে না। তিনি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান চারটি শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন (হানাফি উলেমা, মোহাম্মদী, র‍্যাডিকাল এবং নিম্নবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়) তুলে ধরেছেন, যা মাদ্রাসাগুলোর ধরণ ও পাঠ্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসার মধ্যকার পার্থক্য এবং হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমভিত্তিক বিশ্লেষণও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হচ্ছে এই যে, Aleaz দেখিয়েছেন কীভাবে এই শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম সমাজকে আরও বেশি ‘inward-directed’ বা আত্মকেন্দ্রিক

[22] Khan, Muin-Ud-Din Ahmad, (1967), ‘Economic Conditions of the Muslims of Bengal under the East India Company (1737–1860), Islamic Studies, Vol. 6, No. 3. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, p.p-277-288.

[23] Aleaz, Bonita (2005), ‘Madrasa Education, State and Community Consciousness: Muslims in West Bengal’, Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 6. Economic and Political Weekly, p.p. 555-564.

করে তুলছে, ফলে তারা জাতীয় জীবন ও নাগরিক চেতনায় প্রবেশ করতে পারছে না। তিনি এটিকে একটি বিকল্প ‘সিভিল সোসাইটি’-এর কাঠামো হিসেবে দেখিয়েছেন, যা রাষ্ট্রীয় মূলধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

জাকির হুসেন এবং অমৃতা চ্যাটার্জি, ‘Primary Completion Rates across Socio-Religious Communities in West Bengal’ (2009)[24] প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ও অ-মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাথমিক শিক্ষালাভ সংক্রান্ত অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তাঁরা দেখান যে, শহর ও গ্রাম—উভয় ক্ষেত্রেই মুসলিমদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার হিন্দু উচ্চবর্ণ ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম, এবং তাঁরা পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে এটা প্রমাণ করেন যে, এই প্রবণতা দীর্ঘ সময় ধরেই বিদ্যমান এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের বিশেষ লক্ষণ নেই। এর পিছনে মূলত নিম্ন আয়, বড় পরিবার, পরিবার প্রধানের কম শিক্ষা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ তুলে ধরেন। তবে এগুলিই একমাত্র কারণ নয়, এখানে অবকাঠামোগত ঘাটতিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে তুলে ধরেন যেমন—একাধিক শিক্ষার্থী একটি শ্রেণিকক্ষে, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের অসামঞ্জস্য, এক শ্রেণিকক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয়, অথবা ভবনবিহীন বিদ্যালয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সূচকগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলোতে সরকার পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেয়নি। যদিও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্কলারশিপ বা মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণের মতো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। ফলত মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষা অর্জনের হার অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে।  এই শিক্ষাগত পশ্চাদপসরণ শ্রমবাজারেও তাদের অংশগ্রহণ ও সচ্ছল কর্মসংস্থানে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করছে। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তাঁদের দারিদ্র্যের উচ্চ হারে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতায়, যা পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রাম—উভয় ক্ষেত্রেই প্রকট। এই কারণে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত মুসলিম সমাজের শিক্ষাগত প্রয়োজন পূরণে লক্ষ্যভিত্তিক, অবকাঠামোগত ও সামাজিক সচেতনতা-নির্ভর উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে ধর্মভিত্তিক বৈষম্য প্রশমিত হয়।

প্রণব কুমার দাস ও সুগত মর্জিত, ‘Socio-economic Status of Muslims in West Bengal: Reflections on a Recent Report’ (2016)[25] প্রবন্ধটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত দুটি আলাদা সমীক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে রচিত। এটি একদিকে যেমন ২০০৭-০৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত Minority

[24] Husain, Zakir and Amrita Chatterjee (2009), ‘Primary Completion Rates across Socio-Religious Communities in West Bengal’, Economic and Political Weekly, Vol. 44, No. 15, Economic and Political Weekly, p.p. 59-67.

[25] Das, Pranab Kumar and Sugata Marjit (2016), ‘Socio-economic Status of Muslims in West Bengal: Reflections on a Recent Report’, Economic and Political Weekly, Vol. 51, No. 46, Economic and Political Weekly, p.p. 20-24.

Concentration Districts (MCD) প্রকল্পভুক্ত সমীক্ষার তথ্য উপস্থাপন করে, অন্যদিকে ২০১৩ সালে SNAP নামক বেসরকারি সংস্থার পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে দেখায়। তাঁরা দেখান যে, MCD সমীক্ষাটি একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অ-মুসলিমদের পরিস্থিতিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে পড়া জেলার চিহ্নিতকরণ এবং সেখানে উন্নয়নমূলক হস্তক্ষেপের পথ সুগম করা। এটি ধর্মভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক যেমন সাক্ষরতা, কর্মসংস্থান, গৃহস্থালি অবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করেছিল। অন্যদিকে, SNAP রিপোর্টটি কেবল মুসলিম পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করায়, তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একটি বড় সীমাবদ্ধতা। প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে, SNAP রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী যে মুসলিমদের অবস্থা ২০১৩ সালে অত্যন্ত করুণ, তা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। বরং MCD এবং SNAP উভয় রিপোর্টের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনমান, বিদ্যুৎ ও পানীয়জলের প্রাপ্যতা, সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষার স্তরে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বিশেষত, SNAP রিপোর্টে যে ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে, তার অনেক কিছুই MCD রিপোর্টের তুলনায় ভালো বা একই পর্যায়ে রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে অশিক্ষার হার এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষালাভের হার কিছুটা বেড়েছে। একইভাবে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও মুসলিম অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা এখনও অত্যন্ত সীমিত।

Abhijit Dasgupta, Masahiko Togawa and Abul Barkat edited ‘Minorities and the state, Changing Social and Political Landscape of Bengal’ (2011)[26] বইটি মূলত দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থান কীরূপ, তাদের বিভিন্ন সমস্যাজনিত দিকটি তুলে ধরেছে। অপর দিকে দ্বিতীয় খন্ডে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কী কী ধরণের সমস্যার সমূখীন হতে হচ্ছে তাদের মানবাধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে কী না সে সম্পর্কে লেখকগণ তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধে সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘The Minorities in Post-Partition West Bengal: The Riots of 1950’[27] প্রবন্ধে ১৯৫০ সালে কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সংখ্যালঘু সমস্যার দিকগুলি অনুসন্ধান করেছিলেন। আর এই দাঙ্গার কারণগুলি কী কী তা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মূলত সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করতে

---

26 Dasgupta, Abhijit, Masahiko Togawa and Abul Barkat, (2011), ‘Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal’, SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, India.

27 Bandhopadhya, Sekhar. (2011) ‘The Minorities in Post-Partition West Bengal: The Riots of 1950’. In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) ‘Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal’, SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 3-17.

গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু সম্পর্ক বিভক্ত করার রাষ্ট্রীয় নীতিই সাম্প্রদায়িক উদ্বেগের পিছনে অন্যতম কারণ। এই অধ্যায়ে মূলত সংখ্যালঘু বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিরোধী মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন লেখক, এবং দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক হিংসার অবাঞ্ছিততা সম্পর্কে ঐক্যমত্য থাকলেও নতুন জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্থান কোথায় এ ব্যাপারে দ্বিধাবোধ ছিল।

'On the Margins: Muslims in West Bengal'[28] প্রবন্ধে অভিজিৎ দাসগুপ্ত দেখিয়েছেন যে কীভাবে রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ইতিবাচক পদক্ষেপ বা Affirmative Action থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় প্রান্তিকরনের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার ছ'দশক পরেও তিনি মূলতঃ তিনটি বৃহত্তর ক্ষেত্রের উপর আলোকপাত করেছেন- দলিত এবং অনগ্রসর মুসলিমদের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ (Affirmative Action), স্থানীয় স্তরের রাজনীতি (Local Level Politics), এবং জনসংখ্যার পরিবর্তন (Demographic Change)। তিনি দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, বিভিন্ন পেশাভুক্ত গোষ্ঠীর মানুষ এবং অন্যন্যা অনগ্রসর শ্রেনী (OBC) হিসাবে সুযোগ সুবিধার অধীকারী হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত দলিত ও অনগ্রসর শ্রেনী এই সকল সুযোগ-সুবিধার বাইরে। তিনি দেখিয়েছেন যে, সম্প্রদায় ভিত্তিক ও ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতিতে কীভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করছে সেটাও তিনি এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন।

সমীর কুমার দাস তাঁর' Wrestling with My Shadow: The state and the Immigrant Muslims in Contemporary West Bengal'[29] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার গবেষণায় অনুপ্রবেশ একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শ্রেনীকে 'অনুপ্রবেশকারী' মুসলিম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। লেখক, অভিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অভিবাসী সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিগুলির গতিপ্রকৃতি আলোচনা করেছেন।

Tetsuya Nakatani তাঁর 'Partition Refugees on Borders: Assimilation in West Bengal'[30] প্রবন্ধে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, দেশভাগের সময় অনেক হিন্দু

---

[28] Dasgupta, Abhijit. (2011), 'On the Margins: Muslims in West Bengal'. প্রাগুক্ত, p.p. 18.38.

[29] Das, Samir Kumar, (2011), 'wrestling with My Shadow: The state and the Immigrant Muslims in Contemporary West Bengal'. In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) "Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal", SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 39-65

[30] Nakatani, Tetsuya. (2011) 'Partition Refugees on Borders: Assimilation in West Bengal', প্রাগুক্ত, p.p. 66-90.

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে গিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে, এবং এখানে এসে তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে একান্তীকরনের জন্য নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি মূলত নদীয়া জেলার কয়েকটি গ্রামের ক্ষেত্র সমীক্ষা করে উপলব্ধী করেছেন যে, সীমানা লাগোয়া বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী মানুষজন মূলত বিভিন্ন শ্রেনীর, বিভিন্ন প্রকৃতির অর্থাৎ তারা সমজাতীয় ছিলনা। তাদের মধ্যে ছিল কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকজন, এবং কিছু অনুপ্রবেশকারী বা শরণার্থী। লেখক মূলত বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে তারা কী ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে এবং একটি নতুন জায়গায় এসে তারা কীভাবে বন্দোবস্ত করেছেন সেই সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন উক্ত প্রবন্ধে, যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে আসে।

'Political Economy of Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with the Vested Property Act'[31] প্রবন্ধে Abul Barkat সংখ্যালঘু বিষয়ক রাষ্ট্রীয় নীতির সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শত্রু সম্পত্তি আইন বিধিবদ্ধকরণ ও বাস্তবায়ন এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে এর ধারাবাহিকতা বজায়ের মূলে রয়েছে গভীর এক ঐতিহাসিক চক্রান্ত, যার লক্ষ্য ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী শাসকরা পাকিস্তানকে ইসলামিকরণের পথে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রথম থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করা। এই Enemy Property Act যা Vested Property Act নামে পরিচিত, এই আইনের কার্যকরীতার অভিঘাতগুলো খুবই স্পষ্ট। এটি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত, হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা ও মুক্তি চেতনার প্রতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটায়। ফলস্বরূপ, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতাহীনতা, অসহায়ত্ব, দারিদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতাসহ বঞ্চনার এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এর ফলে লেখক হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ করেছেন এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ক্রমশ যে হ্রাস পাচ্ছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ১৯৬৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ৬০০ জন হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মানুষ হারিয়ে গিয়েছে, যার অধিকাংশই বাংলাদেশের সীমানা লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

Rangalal Sen তাঁর 'Role of Civil Society in Combating Violance aganist Religious Minorities during the Post-2001 General Elections of Bangladesh'[32] প্রবন্ধে তিনি মূলত ২০০১

---

31 Barkat, Abul. (2011) 'Political Economy of Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with the Vested Property Act', প্রাগুক্ত, p.p. 91-118.

32 Sen, Rangalal. (2011) 'Role of Civil Society in Combating Violance aganist Religious Minorities during the Post-2001 General Elections of Bangladesh' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) 'Minorities

সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে সাধারন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কীভাবে হিংসাত্মক আক্রমণ ঘটেছে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেনী বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা ভোটদানের অধিকার থেকে কীভাবে বঞ্চিত হয়েছে, কিংবা তাদেরকে তাদের পছন্দের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

Masahiko Togawa তাঁর 'Hindu Minority in Bangladesh: Migration, Marginalization, and Minority Politics in Bengal'[33] প্রবন্ধে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তাদের বর্তমান অবস্থান কোথায় সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সর্বমোট হিন্দু জনসংখ্যা 11.2 Million যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা 9.1 ভাগ। কিন্তু ১৯৪০ সালের আদমসুমারী অনুসারে এই সংখ্যাটা ছিল শতকরা 22 শতাংশ। এইভাবে দেশভাগের সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি শুধুমাত্র শরণার্থী সমস্যাকে তুলে ধরেননি। একইসাথে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দু সংখ্যালঘু শ্রেনী দৈনন্দিন জীবনে নানারকম আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানসিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে যা তাদের বাধ্য করেছে অন্যত্র চলে যাওয়ার।

'Status of Hindu Women: Spheres of Human Rights Violation in Bangladesh'[34] প্রবন্ধে Sadeka Halim বিশ্লেষণ করেছেন যে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের মানবাধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, তারা কী ধরনের বৈষম্যমূলক আচরনের সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু মহিলাদের অবস্থান বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, হিন্দু মহিলারা মূলতঃ বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক'। তিনি দেখান যে, বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ তাদেরকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে রেখেছে এবং তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর 'প্রান্তিক মানব; পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা' (১৯৯০)[35] বইটি দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভারতে আগমনের দীর্ঘস্থায়ী ও বেদনাদায়ক ইতিহাসকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে

---

and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal', SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 119-132.

33 Togawa, Masahiko. (2011) 'Hindu Minority in Bangladesh: Migration, Marginalization, and Minority Politics in Bengal', প্রাগুক্ত, p.p. 133-164.

34 Halim, Ssdeka. (2011) 'Status of Hindu Women: Spheres of Human Rights Violation in Bangladesh', In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) "Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal", SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 165-183.

35 চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯০), 'প্রান্তিক মানব; পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা', কলকাতা, দীপ প্রকাশন।

ধরেছে। গ্রন্থটির শুরুতেই লেখক উদ্বাস্তু সমস্যাকে সাম্প্রতিককালের এক হৃদয়বিদারক মানবিক বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, পাঞ্জাবের মতো বাংলায় কোনো হঠাৎ ও এককালীন ধ্বংসাত্মক জনবিনিময় হয়নি; বরং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বিতাড়নের প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘকালব্যাপী, যন্ত্রণাময় ও পর্যায়ক্রমিক। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের শুধুমাত্র শারীরিক নয়, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক নিপীড়নও সংঘটিত হয়েছে। লেখক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও স্থানীয় মুসলমানদের একটি অংশের যৌথ ভূমিকায় হিন্দুদের উপর একতরফা দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে তাদের ধনসম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এই জনস্রোত কখনো প্রচণ্ড, কখনো ক্ষীণ হলেও – তা কখনোই সম্পূর্ণ থামেনি।

Justice Surendra Kumar Sinha, তাঁর 'A BROKEN DREAM: Rule of Law, Human Rights & Democracy' (2018)[36] গ্রন্থটি একটি আত্মজীবনীমূলক দলিল, যেখানে তিনি বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের চরম সংকট ও বিকারের চিত্র তুলে ধরেছেন। সিনহা, যিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সংখ্যালঘু হিন্দু প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্বিচারে নিপীড়নের মুখোমুখি করে তোলে। বইটিতে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে ভূমি দখল, ধর্মীয় সহিংসতা ও প্রশাসনিক নিপীড়নের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি, এবং কীভাবে তারা বিচারব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত হন।

আবুল মনসুর আহমেদ, তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৯৯),[37] গ্রন্থে দীর্ঘ ব্রিটিশ বেঙ্গল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ কালপর্বে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের বিবর্তনসহ দেশবিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ছবি প্রকট হয়েছে এই স্মৃতিচারনামূলক গ্রন্থে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নানান ভূমিকা এবং সম্মুখীন হওয়া বহু সংকট এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সালাম আজাত, তাঁর, 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করেছে' (২০০১)[38] এবং 'বাংলাদেশে বিপন্ন সংখ্যালঘু' (২০০৯)[39] গ্রন্থ দুটিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও বাংলাদেশ ভাগের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। সাম্প্রদায়িক

---

36 Justice Sinha, Surendra Kumar, (2018), 'A BROKEN DREAM: Rule of Law, Human Rights & Democracy', Lalitmohan-Dhanabati Memorial Foundation.

37 আহমেদ, আবুল মনসুর, (১৯৯৯), 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল।

38 আজাদ, সালাম, (২০০১) 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করেছে', কলকাতা, সাস পবলিকেশন্স।

39 আজাদ, সালাম, (২০০৯) 'বাংলাদেশে বিপন্ন সংখ্যালঘু', কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স।

বিষবাষ্প কিভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনকে বাংলাদেশ দুর্বিষহ করে তুলেছিল সে ইতিহাসও তিনি আলোচনা করেছেন।

শাহরিয়ার কবির তাঁর ‘বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন’ (২০০৫)[40] গ্রন্থে ২০০১ নির্বাচনোত্তর বি.এন.পি জামাত জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের সংগঠিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও ধর্ষণ, হত্যা ও নানারকম অত্যাচারের ঘটনা তথ্যাকারে তুলে ধরেছেন।

মোল্লা আমীরুল ইসলাম তাঁর ‘হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-২০১১): খুলনা জেলা’ (২০১৮)[41] গ্রন্থে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে বর্তমান বাংলাদেশ কাল পর্বে খুলনা জেলার পূর্ব পাকিস্তানভুক্তি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের কারণ, বিবরণ ও ফলাফল তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তত্ত্বের প্রাচুর্যতার পাশাপাশি মানুষের সাক্ষ্য এই গবেষণামূলক গ্রন্থকে অনন্য সমৃদ্ধ করেছে।

তথাগত রায়ের ‘যা ছিল আমার দেশ’ (২০২২)[42] গ্রন্থে পূর্ববঙ্গে সংঘটিত ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৭১ সালের গণহত্যা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর সাম্প্রদায়িক শক্তির অত্যাচারে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশ নির্বাচনী সহিংসতার কিভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বলপূর্বক দেশত্যাগের পথে ঠেলে দিয়েছে তাও এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য হয়েছে।

Kathinka Sinha-Kerkhoff, তাঁর ‘Tyranny of Partition: Hindu in Bangladesh and Muslims in India, (2006)[43] ও সুলতানা নাহারের ‘সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও ভারত’ (১৯৯৪)[৩৮] এই গ্রন্থগুলিতে ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র সম্পাদিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোতে বাংলাদেশের হিন্দুদের তুলনায় ভারতের মুসলমানদের তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানের চিত্র উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতা এবং দেশান্তরের ভয় ও ভারতের মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার চিত্র প্রতিভাত হয়েছে।

## রিসার্চ গ্যাপ (Research Gap)

ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বহু গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে সাচার কমিটি (২০০৬), রাঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন (২০০৭) ইত্যাদির

---

40 কবির, শাহরিয়ার, (২০০৫) ‘বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন’, ঢাকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

41 ইসলাম, আমীরুল মোল্লা, (২০১৮) ‘হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-২০১১): খুলনা জেলা’, ঢাকা, সুবর্ন প্রকাশনী।

42 তথাগত, (২০২২), ‘যা ছিল আমার দেশ’, কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ।

43 Kathinka Sinha- Kerkhoff, (2006) ‘Tyranny of Partition: Hindu in Bangladesh and Muslims in India’, New Delhi, Gyan Publishing.

রিপোর্ট মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার ব্যাপক চিত্র তুলে ধরেছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক, সেখানে স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিশ্লেষণমূলক গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। বিদ্যমান গবেষণাগুলি প্রায়ই নির্দিষ্ট সময়পর্ব (যেমন সাম্প্রতিক দশক) বা নির্দিষ্ট ইস্যু (যেমন শিক্ষা বা কর্মসংস্থান) কেন্দ্রীক ছিল; কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ধারাবাহিক সময়জুড়ে তাদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তনশীলতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি সুসংহত গবেষণার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাপ পূরণের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবর্তিত রূপ ও গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে একটি সামগ্রিক এবং তত্ত্বভিত্তিক চিত্র নির্মাণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর আলোকে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিমদের পরিচয় ও অধিকার নির্মাণের প্রক্রিয়া এখনও ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত বৈষম্য, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোতে সংখ্যালঘুদের অবস্থান — এইসব বহুমাত্রিক বিষয়ে একটি সামগ্রিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক ও সমসাময়িক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত রয়েছে। তাছাড়া, স্বাধীনতার পরবর্তী দীর্ঘ সময়জুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক অবস্থানের ক্রমবিকাশ, প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন, এবং এইসব পরিবর্তনের পেছনে রাষ্ট্রীয় নীতি ও সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা নিয়ে সামগ্রিক বিশ্লেষণ এখনও প্রায় অনুপস্থিত, এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এলেও, তা প্রধানত ভোটব্যাংক রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র ভোটার বা রাজনৈতিক সমর্থক হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে, বাস্তব ক্ষমতায়নের (নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা, নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার) বিশ্লেষণ গবেষণায় প্রাধান্য পায়নি। ফলে, মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কেবলমাত্র প্রতীকী ছিল নাকি প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়েছে — এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর এখনও অনুপস্থিত রয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও উদ্বাস্তু সমস্যা, ভূমি অধিকার ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত গবেষণা রয়েছে, তবে স্থানীয় সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তির (assimilation) দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার স্তর নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখনও সীমিত। উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রজন্মভিত্তিক আত্মপরিচয় নির্মাণের গবেষণা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

এই গবেষণা ব্যবধানের পটভূমিতেই নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নাবলী প্রণীত হয়েছে, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কিত জটিল বাস্তবতাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

## গবেষণামূলক প্রশ্নাবলী (Research Questions):

সামগ্রিক সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review থেকে এবং সমস্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

(১) দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

(২) স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে?

(৩) স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ কতদূর তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহায়ক হয়েছে?

(৪) পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গিয়ে কোন কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং নিজেদের স্থানীয় সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণ করতে কতখানি সফল হয়েছেন?

## গবেষণার উপাদান

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের জনগণনা রিপোর্ট ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান, ভারত ও বাংলাদেশের সংবিধান ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আইন, ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রনালয় (Ministry of Minority Affairs) কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিপত্র, এবং ভারতের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন (National Commission for Minority) এর রিপোর্ট ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর (Minority Affairs & Madrasah Education Department) ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (west Bengal Minority Development & Finance Corporation) কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ, এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পত্রপত্রিকা ও নির্বাচনী ইশতেহার, সংখ্যালঘু ভিত্তিক সংগঠনগুলোর পত্রপত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একইসাথে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কার্যবিবরণী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কার্যবিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনার ও বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার-এর বিভিন্ন তথ্য, এবং নির্দিষ্ট সময়কালে প্রকাশিত সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কে যুক্তিনির্ভর

করার জন্য মুখ্য উপাদান হিসেবে যুক্ত হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষার (Field Survey) মাধ্যমে স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য। এর পাশাপাশি গৌণ উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পুস্তক, রাজনৈতিক নেতাদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ, আত্মজীবনী, বিভিন্ন প্রজেক্ট রিপোর্ট, বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণামূলক কাজ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNHCR, Minority Rights Group International, Pew Research Centre, UN General Assembly, UN Social & Economic Council, এবং United States Commission on International Religious Freedom কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন নথিপত্র, সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিষয়ক আইন ও অধিকারসমূহ, উদ্বাস্তু সংক্রান্ত দলিলপত্র উদ্বাস্তু সমস্যা ও সংখ্যালঘু অধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বুঝতে সহায়তা করেছে। তবে এ সমস্ত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন এবং ইতিহাসের যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

## গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি বা Research Methodology খুব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার কাজ করার আগে গবেষণাটি কিভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই গবেষণাটি মূলত বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক প্রকৃতির। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি সমীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধনে নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণাপত্র নির্মাণের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। যেমন, প্রথম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা, এগুলি বিভিন্ন লেখ্যাগার, গ্রন্থাগার, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে চয়ন করে তার ব্যবহার এবং সবশেষে নির্বাচিত তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে উপনীত হওয়া।

এই গবেষণায় বাস্তবতার সরাসরি অনুধাবনের জন্য একটি এম্পিরিক্যাল (Empirical) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাই এম্পিরিক্যাল পদ্ধতি হিসেবে তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা (fieldwork), সাক্ষাৎকার (interviews), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (Focus Group Discussion) করা হয়েছে। মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বোঝার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ধুলিয়ান পৌরসভা ও তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর বসতি, পুনর্বাসন, সামাজিক অভিযোজন ও আত্মপরিচয়ের নির্মাণ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির ও পুনর্বাসন কলোনি (বিশেষ করে নদীয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্প, রানাঘাট, রঘুনাথপুর, ও শান্তিপুর) অঞ্চলে সরাসরি অবস্থান করে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোবদ্ধ ও আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী (life history) সংগ্রহের

মাধ্যমেও ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই এম্পিরিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলো পরে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য শ্রেণিবদ্ধ ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল উপাদানগুলি কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য বিধানসভা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র (পার্ক সার্কাস পশ্চিমবঙ্গ), মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিস গ্রন্থাগার (কলকাতা), Centre for Research in Indo-Bangladesh Relations (CRIBR) Libarary (Jodhpur Park, Kolkata), থেকে সংগৃহীত তথ্য এই গবেষণা সন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে সাহায্য করেছে।

## অধ্যায় বিন্যাস (Chapter Outline)

বর্তমান সন্দর্ভটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় নির্দিষ্ট একটি মূল বিষয়কে আলোকপাত করেছে এবং সামগ্রিক গবেষণার কাঠামো গঠনে সহযোগিতা করেছে।

**প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণা প্রকল্পের ভূমিকা** - এখানে গবেষণার পটভূমি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, সাহিত্য অভীক্ষা, গবেষণামূলক সমস্যার বিবৃতি, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণার উপাদান এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে, যা গোটা গবেষণার পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীঃ একটি সামগ্রিক পরিচয়** - এই অধ্যায়ে সংখ্যালঘু সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের ধারণা ও মতবাদ, এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীবিন্যাসের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়াতে সংখ্যালঘু পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ যথা- ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ এর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের অবস্থান এবং সাংবিধানিক অধিকার সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজতাত্ত্বিক চরিত্র সম্পর্কেও একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলির ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

**তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি** - এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস তুলে ধরার পাশাপাশি সেখানকার মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, পেশাগত বিন্যাস, আয় ও জীবনযাত্রার মান বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

সমূক্ষেপ (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এবং তৃনমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে গৃহীত পদক্ষেপ) এবং সংখ্যালঘু উন্নয়নে তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে গঠিত বঞ্চনার ধারা এবং আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিকতার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর (বিশেষভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুগোষ্ঠী) সামাজিক বঞ্চনা এবং নিরাপত্তাহীনতার চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে উভয় অঞ্চলের (যেমন- পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উন্মোচন করা হয়েছে, যাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুত্বের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও প্রকাশ বিশ্লেষিত হয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়ঃ স্বাধীনতার পর বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ** – এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, রাজ্য আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব, এবং ভারতীয় গণতন্ত্রে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যালঘু নীতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে একটি তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিধানসভা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ধর্মীয় সংখ্যালঘু মনোনয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে সংখ্যানুপাতিক অবমূল্যায়ন করেছিল এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বহীনতার বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছিল তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়ঃ পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি কেস স্টাডি** - এই অধ্যায়ে মূলত বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর আগমনের কারণ, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিগমনের স্থান ও তাদের জীবন প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, দেশভাগ, **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া, সামাজিক অভিযোজন ও পরিচয় নির্মাণের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপসংহার** - গবেষণার শেষ অংশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মূল পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সংখ্যালঘুদের টিকে থাকার কৌশল, অভিযোজনের পথরেখা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশ এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকতর ন্যায়সঙ্গত অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু সুপারিশও উপস্থাপিত হয়েছে।

**তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর** **গবেষকের স্বাক্ষর**

সমূক্ষেপ (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এবং তৃনমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে গৃহীত পদক্ষেপ) এবং সংখ্যালঘু উন্নয়নে তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে গঠিত বঞ্চনার ধারা এবং আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিকতার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর (বিশেষভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুগোষ্ঠী) সামাজিক বঞ্চনা এবং নিরাপত্তাহীনতার চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে উভয় অঞ্চলের (যেমন- পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উন্মোচন করা হয়েছে, যাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুত্বের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও প্রকাশ বিশ্লেষিত হয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়ঃ স্বাধীনতার পর বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ** - এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, রাজ্য আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব, এবং ভারতীয় গণতন্ত্রে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যালঘু নীতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে একটি তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিধানসভা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ধর্মীয় সংখ্যালঘু মনোনয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে সংখ্যানুপাতিক অবমূল্যায়ন করেছিল এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বহীনতার বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছিল তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়ঃ পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি কেস স্টাডি** - এই অধ্যায়ে মূলত বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর আগমনের কারণ, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিগমনের স্থান ও তাদের জীবন প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, দেশভাগ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া, সামাজিক অভিযোজন ও পরিচয় নির্মাণের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপসংহার** - গবেষণার শেষ অংশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মূল পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সংখ্যালঘুদের টিকে থাকার কৌশল, অভিযোজনের পথরেখা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশ এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকতর ন্যায়সঙ্গত অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু সুপারিশও উপস্থাপিত হয়েছে।

5/5/25　　　　Ajay Bar 5.05.25

**তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর**　　　　**গবেষকের স্বাক্ষর**

PROFESSOR
Dept. of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032